Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 372
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 364 - 372
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

খুন সাহিত্যের নেপথ্যে : রবীন্দ্র-নজরুল দ্বন্দ্বের একটি পর্যালোচনা

মো: সিয়ামুল ইসলাম সিয়াম
শিক্ষার্থী, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ
Email ID: birbol579@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Literature, Observed, Speech, Refuting, Conflict, Article, Discuss, criticism.

Abstract
Indian polymath Rabindranath Tagore and rebel poet Kazi Nazrul Islam, without a doubt, are considered two of the greatest spokesmen in the history of bengali literature. Needless to say, Nazrul used to respect Rabindranath which knows no bounds. Then again, everyone knows their conflicting ideas & disagreements over few of the topics. On December 13, 1927, Surendranath Dasgupta was one of the most renowned professors at Presidency College, Calcutta. Basically, he felicitated Rabindranath Tagore at the newly formed "Rabindra-Parishad" function in his college. Thenceforth, Rabindranath delivered a speech in response to the reception. On that speech, Rabindranath Tagore strongly comdemned the usage of the Persian (Farsi) word 'Khun' in the sense of blood in Bengali. That's the reason why Kazi Nazrul Islam considered himself to be the target of Tagore and wrote, 'Barar Piriti Balir Bandh' because a few years ago, on May 22, 1926, he had read Rabindranath a poem titled 'Kandari Hushiyar'. In that poem, there is the usage of the word 'Khun' which is used in the sense of blood. However, Rabindranath did not respond to the composition of 'Barar Piriti Balir Bandh'. Pramatha Choudhuri, one of the influential figures of bengali literature, took the responsibility of answering. He wrote in response to Kazi Nazrul's essay, 'Banga Shahitye Khuner Mamla'. Then, his article was published in the 'Shaptahik Atma Shakti' on 3rd of February, 1928. After that, the tide of criticism from both parties was observed in the letters and books of the critics. Later on, Kazi Nazrul Islam was not the target of Rabindranath Tagore's speech. Although he criticized the works of

Kazi Nazrul Islam, he was forced to agree on many issues. In a nutshell, I tried to review and discuss their works refuting each other's allegations.

Discussion

ভারতবর্ষে বিংশ শতাব্দীর অনেক ঘটনাই বেশ সংকটময় পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছিল। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে শুরু করে মধ্যভাগ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলন, খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ দল গঠনসহ ইংরেজ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনের বেড়াজালে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ভারববর্ষের মানব সভ্যতায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর আগেও মানব সভ্যতায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্ত এই বিংশ শতাব্দীতেই স্বাধীনতা এসেছে; হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে দেশভাগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জনপ্রিয়তার শীর্ষে পদার্পণ করেছিলেন এবং ইউরোপ থেকে নোবেল পেয়েছিলেন এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। অপরদিকে কাজী নজরুল ইসলামও এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে গত হয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মূলত দেশবন্ধুর ইন্তেকালের পর বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের রাজনীতি জোরজবরদস্তির দ্বারা শক্তিশালী মহলের হাতে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। বেঙ্গল প্যাক্টের চুক্তি বিনষ্ট হতে শুরু করে। এই অবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত বেশ জোরালোভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল। দেশবন্ধুর অভাব যদি যথাযথভাবে পূরণ করা যেত, তাহলে বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের রাজনীতি অবনতির পর্যায়ে যেত না। আর এই অবনতির ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মধ্যেও ব্যবধান সৃষ্টি হয়। হিন্দু-মুসলমানের এই ব্যবধান রাজনীতি থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক পর্যায়ে এমনকি সাহিত্যের শাখায়ও জোরালো প্রভাব পড়েছিল। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকের নানাবিধ আন্দোলন বহুবিধ প্রেক্ষাপটের পরিপ্রেক্ষিতে সংগঠিত হয়েছে। প্রত্যেকটি আন্দোলন, প্রতিবাদ, জনসংযোগ, চুক্তি ইত্যাদি কার্যক্রম রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের প্রেক্ষিতেই সংগঠিত হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বিদেশি শব্দ ব্যবহারের প্রেক্ষিতে প্রচন্ড কলহের সৃষ্টি হয়। মূলত বিশেষ বিশেষ বিদেশি শব্দ ব্যবহারের ফলস্বরূপ সাহিত্য সমাজে বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয় যা বুদ্ধিজীবী সমাজে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই বাকবিতন্ডার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বঙ্গসাহিত্যের দুই কান্ডারীর দ্বারা। একজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্যজন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

‘১৯২৭ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত। তিনি তার কলেজে নবগঠিত ‘রবীন্দ্র-পরিষদ’ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংবর্ধনার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ মৌখিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণে কবিগুরু বাংলা ভাষায় ফারসি ভাষার ‘খুন’ শব্দটি ’রক্ত’ অর্থে ব্যবহারের সমালোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণটি অবশ্য কেউ রেকর্ড করে রাখেননি। তবে পরবর্তীতে রবীন্দ্র-পরিষদের অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা নিজ হাতে অনুলেখন করছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রদত্ত বক্তৃতার সারকথা প্রথমে দুইটি পত্রিকায় ছাপা হয়। পত্রিকা দুইটির একটি ‘শনিবারের চিঠি’ অন্যটি ‘বাঙ্গালার কথ’।[১] বক্তৃতার সারকথা পত্রিকায় প্রকাশ হবার পর ব্যাপারটি কাজী নজরুল ইসলামের সম্মুখে আসে। কাজী সাহেব নিজেকে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার পাত্র হিসাবে মনে করেন। কেননা বছর খানেক আগেই, ১৯২৬ সালের ২২শে মে, তিনি রবীন্দ্রনাথকে শুনিয়ে এসেছিলেন ‘কাণ্ডারী হুঁশিয়ার’ শিরোনামের একটি কবিতা। সে কবিতায় ‘খুন’ শব্দটির ব্যবহার আছে যা রক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কাজী নজরুল লিখেছিলেন :

“বাঙালির খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর
আমাদেরই খুনে উদিবে সে রবি রাঙিয়া পুনর্বার।”[২]

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 372
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কাজী সাহেব মনে করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রদত্ত বক্তৃতার নিশানা তিনি। বক্তৃতার দশ দিন পর রবীন্দ্রনাথের ভাষণের সারকথার জবাবে কাজী সাহেব 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' শিরোনামে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সাপ্তাহিক আত্মশক্তি পত্রিকায়। এই শিরোনামটি বাংলা ভাষায় বেশ প্রচলিত একটি প্রবাদ। প্রবাদটির অর্থ - বড় লোকের সঙ্গে সাধারণ বন্ধুত্ব বা প্রীতির সম্পর্ক বড্ড একটা স্থায়ী হয় না। বালির বাঁধের মতোই ভেঙ্গে যায় । প্রবাদটি ভারতচন্দ্র রায়ের চরণ থেকে :

"বড় পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে চাঁদ।"[৩]

অপরদিকে কাজী নজরুল ইসলামের 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' লেখার জবাবে প্রমথ চৌধুরী লিখেছিলেন 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ। তার লিখিত প্রবন্ধটি 'সাপ্তাহিক আত্মশক্তি' পত্রিকায় ১৯২৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারিতে ছাপা হয়। অতঃপর পক্ষ-বিপক্ষের সমালোচনার জোয়ার সমালোচকদেরই চিঠিতে, গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়।

সংবর্ধনা জ্ঞাপনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক কথাই বলেছিলেন। তবে তার কিছু বক্তব্যকে কেন্দ্র করে সমালোচনার জোয়ার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বক্তৃতার একটি অংশে বলেছিলেন :

'সৃষ্টিশক্তিতে যখন দৈন্য ঘটে তখনই মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃতরস পরিবেশন করার শক্তি যাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্য সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোন একজন বাঙালি হিন্দু কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'। পুরাতন 'রক্ত' শব্দে তাঁর কাব্যে রাঙা রঙ যদি না ধরে, তা হলে বুঝব সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান।' প্রদত্ত বক্তৃতায় কিছু বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বক্তৃতা প্রথমবার যখন ছাপা হয় তখন 'হিন্দু' শব্দটি ছিল না। অর্থাৎ প্রকৃত বক্তৃতায় বলা হয়েছিল :

> "সেদিন কোন একজন বাঙালি কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন 'খুন'[৪]।

পরবর্তীতে মাসিক 'প্রবাসী' (ফাল্গুন ১৩৩৩) পত্রিকায় ছাপানোর জন্য কবিগুরু নিজ হাতে বক্তৃতাটি লিখে দেন। এবং সেই লেখাতে 'হিন্দু' শব্দটি যুক্ত করা হয়। ড. সলিমুল্লাহ খানের মতে, পরবর্তীতে 'হিন্দু' শব্দটি যুক্ত করার কারণ হতে পারে কবিগুরুর দ্বিতীয় চিন্তার ফল[৫]। মাসিক 'প্রবাসী' ছাড়াও বক্তৃতাটি 'শনিবারের চিঠি' ও 'বাঙ্গলার কথা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। যখন বক্তৃতাটি ছাপা হয় তখন যদি 'হিন্দু' শব্দটি যুক্ত করা হত তাহলে অন্ততপক্ষে কাজী সাহেব নিজেকে কবিগুরুর নিশানা মনে করতেন না। পরবর্তীতে যখন 'হিন্দু' শব্দটি মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় যুক্ত হল, তখন তো 'শনিবারের চিঠি' ও 'বাঙ্গালার কথা' পত্রিকার সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে গেল। কাজী সাহেব তো মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় ছাপানোর পূর্বেই অন্য দুইটি পত্রিকার ছাপা হওয়া বক্তৃতার সারকথা পড়ে নিজেকে কবিগুরুর নিশানা মনে করেছিলেন।

কিন্তু কাজী সাহেব তো বক্তৃতা প্রকাশের দশ দিনের মধ্যেই জবাব দিয়ে 'বড়র পিরীতি বালির বাধ' শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির কিছু চুম্বক অংশ তুলে ধরছি :

"আজকের 'বাঙ্গলার কথা'য় দেখলাম, যিনি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের পক্ষ হয়ে পঞ্চপাণ্ডবকে লাঞ্ছিত করবার সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন, আমাদের উভয় পক্ষের পূজ্য পিতামহ ভীষ্ম-সম সেই মহারথী কবিগুরু এই অভিমন্যু বধে সায় দিয়েছেন— এইটেই এ যুগের পক্ষে সবচেয়ে পীড়াদায়ক। এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে করে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় রক্তকে 'খুন' বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত নিজেও টুপি-পায়জামা পরেন, অথচ, আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হয়ে উঠি কেন, বুঝতে পারিনে।

এই আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন। আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু বংশের অনেকেই পায়জামা শেরওয়ানি-টুপি ব্যবহার করেন, এমনকি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম

হয়ে যায় তখন 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওইগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব!' মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল; তবুও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপের আর অন্ত নেই।
আমি ত টুপি-পায়জামা শেরওয়ানি-দাড়িকে বর্জন করে চলেছি শুধু ঐ 'মিয়া সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই—তবুও নিস্তার নেই।...
আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি। সম্ভ্রান্ত হিন্দু বংশের অনেকেই পায়জামা শেরওয়ানি-টুপি ব্যবহার করেন, এমনকি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তাতে তাঁদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাঁদের ড্রেসের নাম হয়ে যায় তখন 'ওরিয়েন্টাল'। কিন্তু ওই গুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হয়ে যায় 'মিয়া সাহেব'! মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হলে কে যে হারবেন বলা মুশকিল; তবুও নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপের আর অন্ত নেই। আমি ত টুপি-পায়জামা শেরওয়ানি-দাড়িকে বর্জন করে চলেছি শুধু ঐ 'মিয়া সাহেব' বিদ্রূপের ভয়েই—তবুও নিস্তার নেই। ...

'খুন' আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায় মুসলমানি বা বলশেভিকি রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও দু'টোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করছেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।...

তাছাড়া যে 'খুনে'র জন্য কবি-গুরু রাগ করেছেন, তা দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথায় 'কালার-বক্সে' (Colour box) এবং তা 'খুন করা', 'খুন হওয়া' ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়। হৃদয়েরও খুন-খারাবি হতে দেখি আজো। এবং তা শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না। আমার একটা গান আছে—
'উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার'। এই গানটি সেদিন কবি-গুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়তো তাঁর ও-কথার উল্লেখ। তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে— 'উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে রাঙিয়া পুনর্বার' ও করা চন্ত। চলত কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক ফোর্স কমে যেত। আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশনাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর করে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে 'রক্ত খারাবি' ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' না হয় 'খুন-খারাবি' লিখেছি। কবিগুরু মনে করেন, রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে। চলে, কিন্তু ওতে 'রাগ' মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন 'খুন' ফোটে না তেমনি 'রক্ত' ও ফোটে না-নেহাৎ দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে 'খুন-খুনী' খেলি না, কিন্তু 'খুন-সুড়ি' হয়ত করি।...

কবি-গুরুর চরণে, ভক্তের আর একটি সশ্রদ্ধা আবেদন—যদি আমাদের দোষক্রটি হয়েই থাকে, গুরুর অধিকারে সস্নেহে তা দেখিয়ে দিন, আমরা শ্রদ্ধাবনত শিরে তাকে মেনে নিব। কিন্তু যারা শুধু কুৎসিত বিদ্রূপ আর গালিগালাজই করতে শিখেছে তাঁকে তাদেরি বাহন হতে দেখলে আমাদের মাথা লজ্জায়, বেদনায় আপনি হেঁট হয়ে যায় বিশ্বকবি-সম্রাটের আসন—রবিলোক—কাদা-ছোঁড়াছুঁড়ির বহু ঊর্ধ্বে।"
প্রবন্ধটির উল্লেখিত অংশগুলো এবং অন্যান্য অংশগুলো যা বিস্তারিত দেওয়া সম্ভবত হচ্ছে না। এই অংশগুলোকেও সামনে রাখলে এই সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় যে : কবিগুরুর প্রতি কাজী সাহেবের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। তাই তো কবিগুরু বক্তৃতা কাজী সাহেবের মনে আক্ষেপ জন্ম নিয়েছে। তবুও তার প্রতিটি জবাবে নম্রতা, ভদ্রতা, শ্রদ্ধাবোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে[৬]।

কাজী সাহেব স্মরণ করে দিয়েছেন - রচনায় আরবি-ফারসি শব্দ শুধু তিনি করেন নি। তার আগেও ভারতচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথও আরবি-ফারসি ব্যবহার করেছেন করেছেন। কাজী সাহেব বুঝিয়েছেন রচনায় 'খুন' শব্দের ব্যবহারের উদ্দেশ্য মুসলমানী বা বলশেভিকী রং দেওয়ার জন্য নয়। বরং রচনায় রূপ ও গতি দেওয়ার জন্যই ভিন-দেশী কথার প্রয়োগ তিনি করছেন। আর খুন শব্দটি আমাদের সমাজে ব্যবহার হচ্ছে সবসময়। 'খুন' শব্দটি শুধু মুসলমান পাড়ায় নয় সমাজে ব্যবহার হচ্ছে।

কবির অভিভাষণের জবাবে কাজী সাহেবের লেখা 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ' প্রবন্ধটির কোনো প্রত্যুত্তর ছিল না কবি গুরু কর্তৃক। কাজী সাহেবকে কবি গুরুর প্রত্যুত্তর অবশ্যই একটু হলেও আক্ষেপের প্রশমন ঘটাত। তবে কবি গুরুর পক্ষ নিয়ে উত্তর দেবার দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রমথ চৌধুরী। বলা যায় কবিগুরুর মুখপাত্র হিসাবে দায়টা যেন তারই। কাজী সাহেবের প্রত্যুত্তরে লিখলেন, 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা' শিরোনামে প্রবন্ধ

(১৯২৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারিতে সাপ্তাহিক আত্মশক্তি পত্রিকায় ছদ্মনামে প্রকাশ পেয়েছিল) প্রবন্ধের কিছু চুম্বক অংশ তুলে ধরছি :

> "কবিগুরু হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ যে কাজি সাহেবকে লক্ষ্য করে একথা বলেছেন, – এ সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়নি, যদিচ যে সভায় তিনি ও-কথা বলেন সে-সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। যতদূর মনে পড়ে, কোনও উদীয়মান তরুণ কবির নবীন ভাষার উদাহরণ স্বরূপ তিনি 'খুনের' কথা বলেন। কোনও উদিত কবির প্রতি তিনি কটাক্ষ করেন নি।..."[৭]

অর্থাৎ কাজী সাহেব বাংলা সাহিত্যে দশ বছর ধরে উদিত হয়েছেন। তার মানে কী তাকে উদীয়মান কবি? অবশ্যই না। তিনি এখন উদিত কবি। এই অংশের যুক্তি হিসাবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন :

> "সাহিত্য-জগতের তরুণ বলতে কাকে বোঝায়, তার সন্ধান আমি আজও পেলুম না। যদি আমি ও পদবাচ্য না হই তা হলে কাজি সাহেবও তা নন্। কারণ, সাহিত্যিক ঠিকুজি অনুসারে আমার বয়েস ষোল- আর কাজি সাহেবের দশ। সাহিত্যিকরা ত আর বিয়ের কনে নন যে, দশে ও ষোলোয় বেশি তফাৎ করে। গত পরশু একটি সারস্বত সমাজে আমাকে কেউ কেউ প্রবীণ সাহিত্যিক বলে আর পাঁচজনের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন, আমি যদি প্রবীণ হই তা হলে কাজি সাহেব কি করে নবীন হন?"[৮]

চৌধুরী সাহেব নিজেই প্রশ্ন করেছেন।অত:পর নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন।

তবে প্রশ্নগুলো ছিল কাজী সাহেবের উপমার প্রতিধ্বনি। প্রবন্ধে কাজী সাহেব যখন লিখেছিলেন :

> "এই আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি। আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।..."

আর চৌধুরী সাহেবও স্বীকার করে লিখেছিলেন :

> "বাংলা কবিতায় যে 'খুন' চলছে না, এমন কথা আর যেই বলুন রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন না, কারণ, কাজি সাহেব এ পৃথিবীতে আসবার বহু পূর্বে নাবালক ওরফে বালক রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মিকী প্রতিভা' নামক যে কাব্য রচনা করেছিলেন, তার পাতা উল্টে গেলে খুনের সাক্ষাৎ পাবেন। কিন্তু এ সব খুন এত বেমালুম খুন যে, হঠাৎ তা কারও চোখে পড়ে না।"...[৯]

এই বক্তব্যের পরিপেক্ষিতে চৌধুরী সাহেবের আর কোনো কৈফিয়ত ছিল না। আর থাকবেই বা কী করে? কাজী সাহেবের লেখার আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আরবি-ফারসি চর্চার আয়োজন ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় অসংখ্য আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। রবীন্দ্ররচনাবলী বিশ্লেষণে পাঁচশো শব্দের বেশি কেবল আরবি শব্দের ব্যবহার পাওয়া গেছে। আর ফারসি শব্দের ব্যবহার তো আছেই। রবীন্দ্ররচনাবলীতে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগের কিছু নমুনা পেশ করছি - রঙরেজিনী'র (পুনশ্চ) আমিনা-জসীমদের সুযোগ করে কবি সৃষ্টি করেছেন হাজিমোল্লা, বংশু ফকির। লোকজীবনের উপাদান বিকাশ করতে গিয়ে কবি যে শব্দ-চিত্র এঁকেছেন তাতে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ আছে -

১. সমন হয়েছে জারি, কাবুলের সর্দার চলে এল উটে চড়ে-পিছু ঝাড়ুবরদার উটেতে কামড় দিল, হল তার পা টুটা বিলকুল লোকসান হয়ে গেল হাঁটুটা। খেসারত নিয়ে মাথা তেতে ওঠে আমিরের ফউজ পেরিয়ে এলে পাঁচিলটা পামিরের। (আরবি-ফারসি শব্দ প্রায় ৩৪ শতাংশ)

২. শালা ছিল জমাদার খানাতে ভোজ ছিল মোগলাই খানাতে জৌনপুরি কাবাবের গন্ধে ভুরভুর করে সারা গন্ধে। (আরবি-ফারসি শব্দ প্রায় ২০ শতাংশ)।[১০]

এমনকি 'খুন' শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন। যদিও সেই 'খুন' শব্দের প্রয়োগ রক্ত অর্থে করেন নি। কিন্ত 'খুন' শব্দটি হত্যা অর্থে ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও পাঠক মনে রক্তের আভাস আসে।

শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, অনেক বিখ্যাত বাঙালি লেখক-বুদ্ধিজীবীরা আরবি-ফারসি চর্চা করেছেন। যেমন--

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 372
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বাঙালি কবিদের আরবি, ফারসি প্রয়োগ থেকে শুরু করে রামমোহন রায়ের আরবি-ফারসি চর্চা, (তুহফাৎ-উল-মুওয়াহহিদীন - অনন্য অসাধারণ দলিল) থেকে শুরু করে দেবেন্দ্রনাথের আরবি-ফারসি চর্চা, রামকৃষ্ণের সুফি ভাবনায় ফারসি চর্চা, দ্বিজদাস দত্তের কোরানের সূরা চর্চা, কিরণ গোপাল সিংহের আমপারার কাব্যানুবাদ, মধুসূদন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের আরবি ও ফারসি কাব্যচর্চা, বিবেকানন্দের ইসলাম ও মহম্মদ চর্চা, জীবনানন্দের কবিতায় আরবি-ফারসির ব্যবহার, শঙ্খ ঘোষ সহ অনেক বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা যত্ন সহকারে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাই প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করে চৌধুরী সাহেব তার প্রবন্ধে আরবী-ফারসি শব্দ ব্যবহারের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। আরবি-ফারসি শব্দ ব্যতীত বাংলা ভাষার অবস্থা বুঝাতে তিনি লিখেছেন – "আরবী-ফার্সি শব্দ যদি ত্যাগ করতে হয়, তা'হলে আমাদের সর্বাগ্রে 'কলম' ছাড়তে হয়। কারণ ও-শব্দটি শুধু আরবী নয়, এমন অনির্বচনীয় আরবী যে ও-শব্দ হাঁ ক'রে কণ্ঠমূল থেকে উদ্গিরণ করতে হয়। ও 'ক' হিন্দু জবানে বেরয় না এক কাশি ছাড়া[১১]। চৌধুরী সাহেবের লেখার সাথে রঙ্গ করে বলা যায় - আরবি-ফারসি শব্দ বাদ দিলে তো নিজের 'নাম' (ফারসি শব্দ) লিখবেন কী করে? নামের 'সই' (আরবি শব্দ) কীভাবে দিবে? লেখার জন্য 'কাগজ' (ফারসি শব্দ), 'কলম' (আরবি শব্দ) প্রয়োজন তা বলবে কোন ভাষায়?

অতঃপর মামলা (আরবি ভাষা) 'আদালত' (আরবি ভাষা) প্রাঙ্গণে বিচার চাইবে কী করে? মূলত বাংলা ভাষায় কয়েক হাজারের বেশি আরবি-ফারসি শব্দ রয়েছে যা আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হয়। আর প্রয়োগ তো হবেই, কেননা বাংলা ভাষা গ্রহণ করেছে এমন সব অজস্র আরবি-ফারসি শব্দ রয়েছে মানুষের মুখে মুখে। অথচ অনেকেই জানেই না বাংলা ভাষার মধ্যে অন্যান্য ভাষার হিসাব। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি শব্দের সংখ্যা দুই হাজারের বেশি বলেছেন। অন্যদিকে ড.গোলাম মাকসূদ হিলালী তাঁর Perso Arabic Elements In Bengali গ্রন্থে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের সংখ্যা ৫, ১৮৬টি বলে উল্লেখ করেছেন। মোহাম্মদ হারুন রশিদ সংকলিত 'বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী ফারসী শব্দের অভিধান' গ্রন্থে আরবি শব্দের ভুক্তি এনেছেন প্রায় ৪,০০০। অধিক পরিমাণে আরবি-ফারসি-তুর্কি ভাষার আগমন হয়েছিল মূলত তুর্কি সেনাদের দ্বারা বাংলা বিজিত হওয়ার পর থেকে। তুর্কিরা ধর্মে ইসলামী এবং সংস্কৃতিতে ফারসি। সরকারি ভাষা হিসাবে ফারসি ব্যবহার করলেও অনেক ক্ষেত্রে আরবি ভাষা প্রয়োগ করা হত। তৎকালীন ভারতবর্ষে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি ভাষার শব্দ আগমনের তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করা যায় :

১. বণিক ও সুফিদের ভূমিকা,

২. মুসলিম শাসকদের ভূমিকা,

৩. সাহিত্যিকদের ভূমিকা।

সাহিত্যিকদের ভূমিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ছিল কাব্যপ্রধান। এ যুগে বাংলায় ফারসির ব্যাপক চর্চা ছিল। হিন্দুধর্ম, ইসলাম ও বাংলার লৌকিক ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এই সময়ের বাংলা সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, শাক্তপদাবলি, বৈষ্ণব সন্তজীবনী, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত-এর বঙ্গানুবাদের পাশাপাশি পীরসাহিত্য এবং ইসলামি ধর্মসাহিত্য ছিল এই কালের সাহিত্যের মূল বিষয়। মুসলমান কবিরা স্বরচিত ফারসি কবিতা এবং বিখ্যাত ইরানি কবিদের কবিতা পড়তেন এবং দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রচুর আরবি ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হতো। এ বিষয়ে মুহম্মদ এনামুল হক বলেন- 'মুঘল আমলের প্রায় অধিকাংশ বাংলা সাহিত্য বিশেষ করিয়া মুসলিম বাংলা সাহিত্য ফারসি ভাষার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে ভরপুর হইয়া উঠে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দেখিয়েছেন বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাত্র কয়েকটি আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু দ্বিজ চন্ডীদাসের পদে অনেক আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। মধ্যযুগের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাব্যের নাম এখানে উল্লেখ করা হল, যেগুলোর নামেই আরবি-ফারসি শব্দের উপস্থিতি রয়েছে। যেমন- সৈয়দ সুলতানের লেখা ওফাত-ই-রসুল, নবীবংশ, শেখ পরানের লেখা নূরনামা, নসিহতনামা, মোহাম্মদ খানের লেখা মুকতুল হোসেন, শাহ মুহাম্মদ সগীরের লেখা ইউসুফ জোলেখা মধ্যযুগের দু'জন বিখ্যাত কবি আলাওল এবং ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। মহাকবি আলাওল

ছিলেন আরাকান রাজসভার প্রধান কবি। তিনি আরবি ও ফারসি ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের আগমন আকস্মিক ভাবে হয়নি। বরং প্রয়োজনের তাগিদেই বাংলা ভাষা এসব শব্দগুলোকে গ্রহণ করেছে।[১২]

সাহিত্যিকদের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে কাজী সাহেব বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বোঝাতে চেয়েছেন 'খুন' শব্দ তো বাংলা ভাষায় নিত্য ব্যবহৃত শব্দ। আর তিনি এও বুঝিয়েছেন যে, 'খুন' শব্দের যথাযথ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি বেমানান অবস্থা তৈরি করেননি।

এই ক্ষেত্রে কাজী সাহেব যুক্তি পেশ কর লিখেছিলেন -

> "আমি যেখানে 'খুন' শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম ন্যাশনাল সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে 'রক্তধারা' লিখবার, সেখানে জোর করে 'খুনধারা' লিখি নাই। তাই বলে 'রক্ত খারাবি'ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি' না হয় 'খুন-খারাবি' লিখেছি। ..."

তিনি কেবলই রচনার সৌন্দর্যের জন্যই ফারসি শব্দ 'খুন' ব্যবহার করেছেন। শুধু 'খুন' শব্দের ক্ষেত্রে নয় বরং রচনায় সৌন্দর্যের জন্য বিদেশি শব্দ প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। কাজী সাহেবের এই বিদেশি শব্দের প্রয়োগে কবি গুরু যে বেশ খুশি হয়ে তার প্রশংসা করেছেন তা নিজ দায়িত্বে ব্যক্ত করেছেন। কবিগুরু যে নিজেও প্রয়োজনের খাতিরে বিদেশি শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন তাও স্মরণ করিয়েছিলেন প্রবন্ধে। কাজী সাহেব প্রবন্ধটিতে বলেছিলেন -

> "উতারো ঘোমটা' তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। 'ঘোমটা খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। 'উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়ত সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধীই হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায়, তা' ত কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভালো শোনাবার লোভেই ঐ একটি ভিন্-দেশী কথার প্রয়োগ অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও কতদিন আলাপ-আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন। ..."

অপরদিকে উপরিউক্ত অংশের পরিপেক্ষিতে চৌধুরী সাহেব লিখেছিলেন – 'কথায় কথায় রক্তকে খুন বলাটা যে সাহিত্যিক অপরাধ। তার কারণ, কথায় কথায় খুনকে রক্ত বলাটাও সমান অপরাধ'। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উপামা দিয়ে লিখেছিলেন-

> "যার নাম ভাজা চাল তার নাম চাল-ভাজার অদ্বৈতবাদ অচল। কথা সত্য তাই বলে বঙ্গ সাহিত্যে মুড়ি ও চাল ভাজার অদ্বৈতবাদ অচল। ন্যায়সঙ্গত খুন ও রক্তের অদ্বৈতবাদ অচল।"[১৩]

তবে চৌধুরী সাহেব 'খুন' শব্দ প্রয়োগের গুরুত্ব স্বীকার করে বুঝাতে চেয়েছেন, কবিতা রচনায় একটির সাথে অপরটির মিলের প্রয়োজন। যাতে করে কবিতা রচনা রুচিশীল হয় এবং কবিতার সৌন্দর্য বহাল থাকে। এই বিষয়ে চৌধুরী সাহেব লিখেছিলেন -

> "সর্বশেষে খুনের একটি গুণের উল্লেখ করব— যেটি রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেন নি। কবিতা লিখতে মিলের প্রয়োজন— অন্তত বাংলা কবিতাতে তা তাই। এখন বাংলা ভাষায় খুনের যত মিল খুঁজে পাওয়া যায়, রক্তের তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না।"

চৌধুরী সাহেব যেমন বিদেশি শব্দের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন বিধেয় বিদেশি শব্দের গুণাবলী এবং প্রয়োগে বাংলা ভাষার রুচিশীলতা বৃদ্ধি তা স্পষ্ট তুলে ধরেছিলেন। চৌধুরী সাহেবের অনেক আগেই বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই ব্যাপারটি স্পষ্ট করেছেন। যেমন- বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,

> "নূতন শব্দের আমদানী ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করে, ওতে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নাই। তবে নূতন শব্দ সুত্তযুক্ত হওয়া চাই - অপপ্রয়োগেই যা - কিছু আপত্তি। প্রয়োজনবোধে আরবি, ফার্সি, ইংরেজি, ফরাসি, পর্তুগিজ, চাইনিজ, এমন কিছু গ্রাম্য এবং বন্যশব্দ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য।"[১৪]

'যে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাটি বলেছিলেন, তখন ভাষার বিশুদ্ধতা নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে লড়াই চলছিল। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তখন বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষার শব্দের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ফতোয়া জারি করেছিলেন। তারা তাদের যুক্তি পেশ করেছিলেন। তারা বুঝাতে চেয়েছিলেন, বাংলা ভাষা যেহেতু সংস্কতের দুহিতা, তাই সংস্কৃত ছাড়া অন্য শব্দের আমদানীর ফলে বাংলা ভাষা দূষিত হবে। বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের প্রয়োগে পক্ষ-বিপক্ষের যুক্তিতর্ক হয়ে আসছিল সেকাল থেকেই।

চৌধুরী সাহেবের খুনের মামলা বিশ্লেষণ করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে,তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন কবিগুরুর নিশানা কাজী সাহেব নন। যথেষ্ট প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। বেশ কিছু বক্তব্যে কাজী সাহেবের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তবে প্রশ্নবিদ্ধ বিষয় হচ্ছে, প্রবন্ধে তিনি 'হিন্দু' শব্দটির প্রসঙ্গ মোটেও বিশ্লেষণ করেননি। অথচ তিনি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অবশ্যই নিজে কানে বক্তৃতা শুনেছিলেন। কিন্ত তারপরও হিন্দু শব্দটির প্রসঙ্গ কেন আনেননি সেই কারণ অস্পষ্ট। হতে পারে আসলেই 'হিন্দু' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ছিল কিন্ত মুখে উচ্চারিত হয়নি। পরবর্তীতে দ্বিতীয় চিন্তার ফলস্বরূপ 'হিন্দু' শব্দটি যুক্ত করেন। আর 'হিন্দু' শব্দটি যুক্ত করার ফলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে,কাজী সাহেব তার নিশানা নন। খুনের মামলায় এই অভিযোগ থেকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে রায় দেওয়াই যায়। কিন্ত এক্ষেত্রে একটি বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ। ধরে নিলাম সেইদিনের বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু শব্দটি মনে মনে ভেবে বক্তব্য দিয়েছিলেন। কিন্ত তা প্রকাশের বেলায় অন্তরালে রয়ে গিয়েছিল কোনো কারনে। এবং কাজী সাহেবকেও লক্ষ্য করে তিনি কোনো বক্তৃতা করেনও নি। এতে করে নতুন একটি প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে - কবিগুরু তাহলে হিন্দু লেখদের রচনায় 'খুন' শব্দের প্রয়োগে আপত্তি আছে তবে মুসলমান লেখকের রচনায় 'খুন' শব্দের প্রয়োগে আপত্তি নেই। হিন্দু বাঙালীর ক্ষেত্রে শব্দটি আপত্তিকর কিন্ত মুসলমান বাঙালীর ক্ষেত্রে শব্দটি স্বাধীন। এই অভিযোগ থেকে অবশ্যই কবিগুরুকে রেহাই দেওয়া যায় না। এই বিষয়ে লেখক ও গবেষক সুমীতা চক্রবর্তী 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা : অন্তীম রায়' শিরোনামের প্রবন্ধে উল্লেখ করেন -

> "রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে লক্ষ করে না বললেও মূল কথাটা থেকেই যে, বাঙালি হিন্দুর লেখা বাংলা কবিতায় 'খুন' শব্দের প্রয়োগে একটু আপত্তিই চীন তাঁর। আজকের যুগে দাঁড়িয়ে এমন কোনো প্রস্তাবকে আমরা এক বিন্দু সমর্থনিয় না যে, হিন্দু কবি 'খুন' লিখতে পারবেন না আর মুসলমান কবি পারবেন। ভাষার এহেন সাম্প্রদায়িকতা নীতিগত ভাবে আমরা স্বীকার করি না আজ।"[১৫]

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের বিদেশি ভাষা প্রয়োগে আপত্তি থাকতেই পারে। কিন্ত তার মানে এই নয় যে,তিনি হিন্দু-মুসলিম লেখকদের মাঝে দেয়াল তৈরি করার মতো কথা বলতে পারবেন।

এতে অভিযোগের সুর তার দিকেই নিশানা হবে। হিন্দু বাঙালিরা বলবে, জল আর মুসলমান বাঙালিরা বলবে, পানি? মুসলমান বাঙালিরা নিজেদের অবস্থা বোঝাতে ফারসি শব্দ হাওয়া আর শরম বলবেন। অপরদিকে হিন্দু বাঙালিরা ফারসি শব্দের পরিবর্তে বলবেন বাতাস আর লজ্জা? এই অভিযোগ থেকে আর রবীন্দ্রনাথকে রেহাই দেওয়া গেল না।
তবে মনে রাখতে হবে, কাজী সাহেবের প্রবন্ধটিতে কাজী সাহেবের আক্ষেপ নাকি প্রতিবাদ পরিস্ফুটিত হয়েছে তা বলা সহজ নয়। তবে আক্ষেপের বিষয়টিকে সমালোচকগণ প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এই ঘটনার বেশ কিছু সময় পর রবীন্দ্র-নজরুল বিবাদ মিটে যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের পরবর্তীকালীন সম্পর্কের কোনো ভাটা পড়েনি। বিশেষ করে চৌধুরী সাহেবের মধ্যস্ততায় এর পরিসমাপ্তি ঘটে। নজরুল জীবনীকার রফিকুল ইসলাম লিখেছেন -

> "... প্রমথ চৌধুরীর এই প্রবন্ধের ফলে ভুল বোঝাবুঝির অনেকটাও অবসান ঘটে এবং নজরুল প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে। ফলে তাদের পূর্বেকার স্বাভাবিক সম্পর্ক পুন:প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১৬]

স্মরণে রাখতে হবে, একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম বিদ্বেষী বলার সুযোগও নেই। রবীন্দ্রনাথের জীবনী বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, তিনি কতটা অসাম্প্রদায়িক ছিলেন। দীর্ঘ জীবনে কবিগুরুর অনেক

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 364 - 372
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানসিক পরিবর্তন এসেছে। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি যে একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ ছিলেন তা বোঝার জন্য অনেক দৃষ্টান্তই আমাদের সম্মুখে রেখে গেছেন।

Reference:

১. খান, ড. সলিমুল্লাহ, 'ঠাকুরের মাৎস্যন্যায় : ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা', ঢাকা: মধুপোক, ২০২৩, পৃ. ২৭-২৮

২. রায়, গোপালচন্দ্র, 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল', কলকাতা : র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৫৬, পৃ. ৫২-৫৫

৩. তদেব, পৃ. ৫৬-৫৭

৪. কবির অভিভাষণ, 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ১২শ খন্ড, সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : বিশ্বভারতী, পৃ. ৫০৭-৫১১

৫. খান, ড. সলিমুল্লাহ, 'ঠাকুরের মাৎস্যন্যায় : ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা', ঢাকা : মধুপোক, ২০২৩, পৃ. ৩১-৩২

৬. 'বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, নজরুল-রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭ খ, পৃ. ৪১-৪২

৭. চৌধুরী, প্রমথ, 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা', কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল-রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭, পৃ. ৬৫৮

৮. তদেব, পৃ. ৬৫৯

৯. তদেব, পৃ. ৬৫৯

১০. কামরুজ্জামান, 'বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের আরবী-ফারসি চর্চা', কলকাতা : এডুকেশন ফোরাম, ২০২২, পৃ. ১৯২-১৯৩

১১. চৌধুরী, প্রমথ, 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা', কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল-রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭, পৃ. ৬৫৯-৬০

১২. ইফফাত আরা দোলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের উপস্থাপিত এম.ফিল অভিসন্দর্ভ, নজরুলের অভিভাষণ ও প্রবন্ধে বিদেশী শব্দের ব্যবহার : একটি ভাষাবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, রেজি নং ২৪/২০১৪-২০১৫, পৃ. ৪২-৬০

১৩. চৌধুরী, প্রমথ, 'বঙ্গ-সাহিত্যে খুনের মামলা', কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল-রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, ২য় খণ্ড, ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ১৯৬৭, পৃ. ৬৫৯-৬৬০

১৪. দৃষ্টিকোণ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আহমদ পাবলিশিং হাউস ১৩৭৪, পৃ. ৩৬-৩৭

১৫. চক্রবর্তী, সুমিতা, 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা : অন্তিম রায়', সৃষ্টি-স্বাতন্ত্রে নজরুল, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৭, পৃ. ১৬১-১৬৮

১৬. ইসলাম, রফিকুল, নজরুল জীবনী, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২

Bibliography:

ড. সলিমুল্লাহ খান, 'ঠাকুরের মাৎস্যন্যায় : ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা', ঢাকা : মধুপোক, ২০২৩

গোপালচন্দ্র রায়, 'রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল', কলকাতা : র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, ১৯৫৬

সুমিতা চক্রবর্তী, 'বাংলা সাহিত্যে খুনের মামলা : অন্তিম রায়', সৃষ্টি-স্বাতন্ত্রে নজরুল, কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ২০০৭